আল-আসমাউল হুসনা (اَلْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى)

আসমাউল হুসনা আরবি শব্দ। আসমা শব্দের অর্থ নামসমূহ। আর হুসনা অর্থ সুন্দরতম। অতএব, আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দরতম নামসমূহ। আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর নামকে একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন—

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

অর্থ: "আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব, তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮০)

২.আল্লাহ পাকের ৫ টি গুণবাচক নাম অর্থসহঃ

الملك		আল-মালিক	সর্বকর্তৃত্বময়
القدوس		আল-কুদ্দুস	নিষ্কলুষ, অতি পবিত্র
السلام		আস-সালাম	নিরাপত্তা-দানকারী, শান্তি-দানকারী
المؤمن		আল-মু'মিন	নিরাপত্তা ও ঈম দানকারী
المهيمن		আল-মুহাইমিন	পরিপূর্ন রক্ষণাবেক্ষণকা

৩.তুমি কিভাবে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে পারো?

আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের আধার। যেমন: তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, ক্ষমাশীল, দয়াবান, ধৈর্যশীল, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, প্রতিপালক ইত্যাদি। এমন কোনো গুণ নেই যা তাঁর মধ্যে নেই। এসব গুণের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এগুলো হলো গুণবাচক নাম। গুণবাচক এসব নামই আসমাউল হুসনা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। আমরা আল্লাহ পাকের ৯৯টি (নিরানব্বইটি) গুণবাচক নামের কথা জানি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের কোনো শেষ নেই। এগুলো অসংখ্য। তবে বেশি উল্লেখযোগ্য হলো এ নিরানব্বইটি নাম।

এসব নাম আল্লাহ তায়ালার পরিচয় প্রকাশ করে। যেমন: আল্লাহু খালিক। খালিক অর্থ সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টা। সুতরাং আমরা এ নাম দ্বারা বুঝতে পারি যে, এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। এভাবে গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালোভাবে চিনতে পারি। ফলে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়। আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ আমরা অনুশীলন করব। এতে আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে। সকলেই আমাদের ভালোবাসবে। আল্লাহ তায়ালাও আমাদের ভালোবাসবেন।

৪.দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্রঃ

বলা হয়ে থাকে, 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।' শস্যক্ষেত্রে মানুষ যেরূপ চাষাবাদ করে সেরূপ ফসল লাভ করে। যেমন কেউ ধান চাষ করলে ধান লাভ করে। গম চাষ করলে গম লাভ করে। তেমনি ভালো করে চাষাবাদ করলে ফসল বেশি লাভ করে। আর অলসতার কারণে চাষাবাদ না করে জমি ফেলে রাখলে সে কিছুই লাভ করে না। দুনিয়া ও আখিরাতের অবস্থাও ঠিক তেমন। আমরা যদি দুনিয়াতে ভালো কাজ করি, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলি তাহলে আখিরাতে ভালো ফল লাভ করব। আর যদি নিজ ইচ্ছামতো চলাফেরা করি, অন্যায় ও পাপ কাজ করি তাহলে আমরা পরকালে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবো। সুতরাং পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য দুনিয়াতেই আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

Class 7:

আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

আকাইদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো আকিদাহ। আকিদাহ অর্থ বিশ্বাস। আর আকাইদ শব্দের অর্থ বিশ্বাসমালা। ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় হলো আকাইদ। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর উপর মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকেই আকাইদ বলা হয়। আকাইদের সবগুলো বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম আকাইদ। যে এসব বিষয়ে বিশ্বাস করে, সে-ই ইসলামের প্রবেশকারী বা মুসলিম।

২.তাওহিদ বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তাঃ

আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ইমান ও ইসলামে প্রবেশ করে। তাওহিদে বা একত্ববাদে বিশ্বাসের পর আকাইদের অন্যান্য বিষয় বিশ্বাস করতে হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দুনিয়াতে অনেক নবি-রাসুল আগমন করেছেন। তাঁরা সকলেই তাওহিদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। তাঁদের সকলের দাওয়াতের মূল বাণী ছিল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই'। এমন কোনো নবি ছিলেন না যিনি তাওহিদের কথা বলেন নি। বরং সকল নবি-রাসুলই তাওহিদের শিক্ষা প্রচার করেছেন। ইসলামের সকল বিধি-বিধান তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহিদের পরিপন্থী কোনো বিধান ইসলামে নেই। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ- সকল ইবাদতই এক আল্লাহর জন্য করতে হয়। কোনো কিছু চাইতে হলেও এক আল্লাহর নিকট চাইতে হয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। অতএব, ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.কুফরির পরিণামঃ

কুফরের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি নৈতিকতা ও মানবিক আদর্শের বিপরীত। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা। তিনিই আমাদের রিজিকদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। সুতরাং তাঁকে অবিশ্বাস করা কিংবা তাঁর বিধান অস্বীকার করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। এটি চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল। কাফিরদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আখিরাতে কাফিরদের স্থান হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অর্থ : "আর যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)

কুফরির শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। অবশ্য কাফির ব্যক্তি যদি পুনরায় ইমান আনে এবং ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে সে এ শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। সাথে সাথে তাকে অবশ্যই পূর্ববর্তী কুফরি কাজের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত হতে হবে এবং খাঁটি মনে তওবা করতে হবে।

অতএব, আমরা কুফর ও এর কুফল সম্পর্কে জেনে এ থেকে বেঁচে থাকব। এজন্য সর্বদা সতর্ক থাকব।

শিরকের কুফল ও পরিণতি

শিরক হলো জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)

শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যায় আচরণ করে। কেননা আল্লাহ তায়ালাই মানুষের একমাত্র স্রষ্টা। সকল ইবাদত ও প্রশংসা লাভের হকদারও তিনিই। শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করে। ফলে আল্লাহর সাথে চরম অন্যায় করা হয়।

অন্যদিকে শিরক মানুষের মর্যাদাহানিকর কর্মও বটে। কেননা মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ মুশরিকরা শিরকে লিপ্ত হয়ে অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে। ফলে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। এজন্যই কুরআন মজিদে শিরককে সবচেয়ে বড় যুলুম বলা হয়েছে।

শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্য যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৬)

আমরা শিরক ও এর কুফল সম্পর্কে ভালোভাবে জানব এবং সর্বদা এ জঘন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব। আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদেরকে শিরকের কুফল ও শোচনীয় পরিণতির কথা বলে সতর্ক করব।

Class 8:

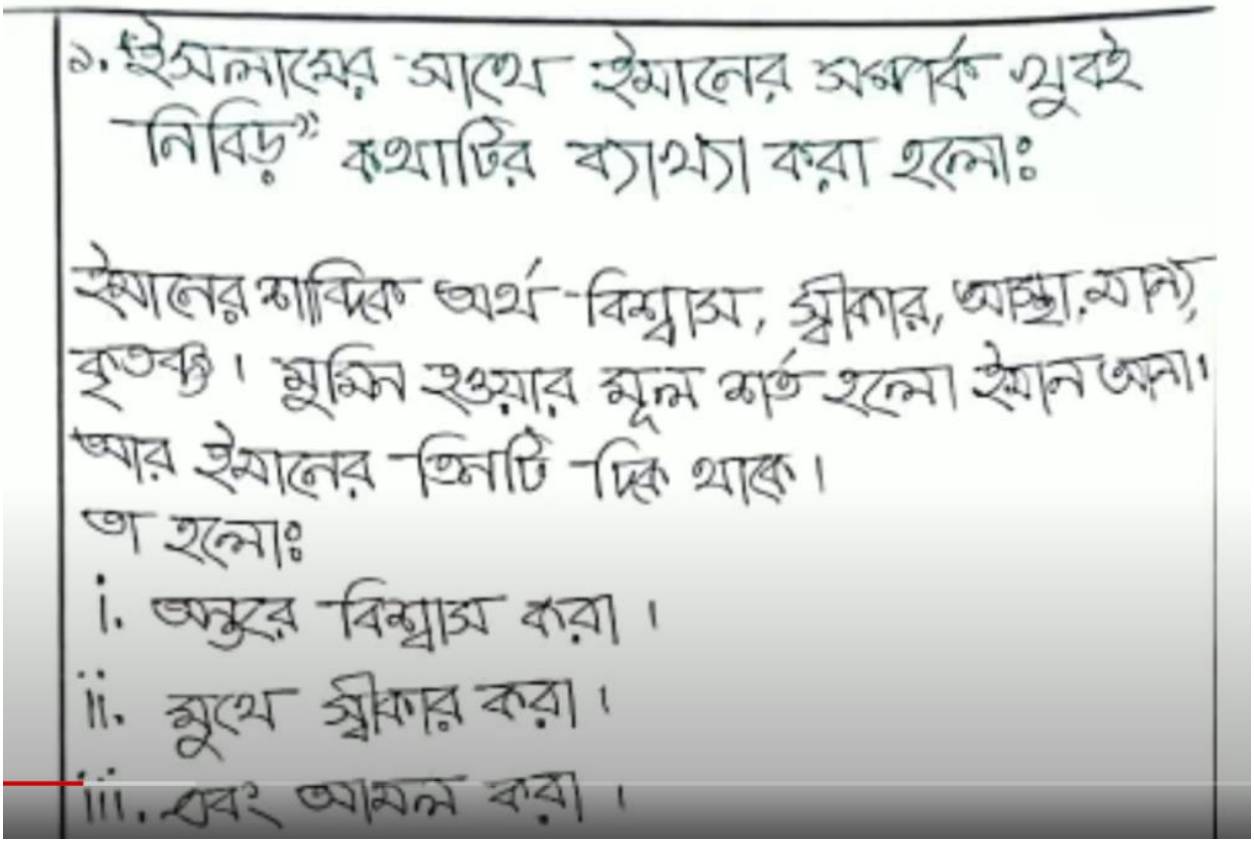

১. ইসলামের সাথে ইমানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়" কথাটির ব্যাখ্যা করা হলোঃ

ইমানের শাব্দিক অর্থ-বিশ্বাস, স্বীকার, আস্থা, সত্য, কৃতজ্ঞ। মুমিন হওয়ার মূল শর্ত হলো ইমান আনা। আর ইমানের তিনটি দিক থাকে।
তা হলোঃ

i. অন্তরে বিশ্বাস করা।
ii. মুখে স্বীকার করা।
iii. এবং আমল করা।

আর এই তিনটি দিক সরাসরি ইসলামের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো বশ্যতা, সমর্পন, আত্মসমর্পন, অনুগত করা।

ঈমানের ৭টি স্তরের প্রথম স্তরটি হলো আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ঈমান আনা। তিনি আমাদের রব, বিচার দিনের মালিক, সর্ব ক্ষমতার অধিকারী, ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আল্লাহর যে ৯৯টি গুনবাচক নাম রয়েছে সবগুলোর উপর ঈমান আনতে হবে। এই

ইমান অন্তর থেকে আনতে হবে। মোট কথা নিজেকে, নিজের সব ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সমর্পন করার নামই হলো ইমান। এবং তা ইমানের তিনটি দিক দিয়ে আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

ইমানে দ্বিতীয় স্তরটি হলো ফেরেশতাগনের প্রতি বিশ্বাস করা। ফেরেশতাগন নূরের তৈরি এবং অদৃশ্য। তারা পুরুষ নন নারীও নন। তারা সর্বদা আল্লাহর হুকুম মেনে চলছেন।

ইমানের তৃতীয় স্তরটি হলো আসমানি কিতাবের উপর বিশ্বাস করা। মানবজাতির কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক নবীদের উপর কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলোকে আসমানি কিতাব বলা হয়। সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল হয়। এরমধ্যে ১০০খানা ছোট

আর বাকি ৪ খানা বড় কিতাব। এগুলো হলো- তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও আল-কুরআন। কুরআন হলো সর্বশেষ কিতাব এবং গোটা মানবজাতির পূর্নাঙ্গ জীবন-বিধান।

ঈমানের চতুর্থ স্তরটি হলো নবি-রাসুলগনের প্রতি বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহ তা'লা মানব-জাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। মূলত তারা ছিলেন আল্লাহর [illegible]

আমাদের পথনির্দেশক। তারা আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন। সর্বপ্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আ.) এবং সর্বশেষ নবি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। আমরা তার উম্মত।

পঞ্চম স্তরটি হলো আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করা। আখিরাত হলো পরকাল। যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। মুলত এ জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর পর থেকেই। পরকাল যাপার শুরু হয়

ধাপে ধাপে। যেমনঃ মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম।

ঈমানের ষষ্ঠ স্তরটি হলো তকদির এর প্রতি বিশ্বাস করা। তকদির মানে হলো ভাগ্য। যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের সাথে যা যা হয় সবই আল্লাহর হুকুমে। তাই একজন মুমিনের উচিত ভালো খারাপ যাই ঘটুক না কেন হতাশ না হয়ে আল্লাহকে সর্বদা শুকরিয়া করা।

SUBSCRIB

শেষ ও সপ্তম স্তরটি হলো মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস করা। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আছে আল্লাহ সবাই কে পুনরায় জীবিত করবে। আমাদের সকল কাজের হিসাব নিবে। আল্লাহর বিচার ব্যবস্থা হবে খুবই সূক্ষ্ম ও দ্রুত। উপরিউক্ত ৭টি স্তর হলো ঈমানের বিষয় ভিত্তি। যা আমাদের সবাইকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

মহানবী (সা:) বলেছেন -

ঈমান হলো- তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তার রাসুলগণের প্রতি ও শেষ দিবসের (আখিরাতে) প্রতি এবং ভাগ্যের (তাকদিরে) ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস করবে"।

আল্লাহ কুরআন বলেন-

"আর যে আল্লাহকে ও তাঁর ফেরেশতাদেরকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রাসুলগণকে এবং

"আর যে আল্লাহকে ও তাঁর ফেরেশতাদেরকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রাসুলগণকে এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে, সে বহুদূরে পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হয়েছে।
(আন-নিসা ৪:১৩৬)

রাসুল (সা:) আরও বলেছেন, "ইসলাম হলো বাহ্যিক আর ঈমান হলো অন্তরের বিষয়।

ঈমান ও আমল, এই দুইয়ের সমন্বয়েই হচ্ছে ইসলাম। ঈমান হলো বাহ্যি অন্তরের আমল আর ইসলাম হলো বাহ্যিক আমলের নাম।

যে ঈমান বা বিশ্বাস আনে সে মুমিন। যে বাহ্যিক আমলগুলি করে সে মুসলিম। আমাদের উভয় আমল করতে হবে। তাই পরিশেষে বলা যায় ইসলামের সাথে ঈমানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

২. কপটতার নিদর্শন গুলো কী কী?

উত্তরঃ কপটতা মানে ভন্ডামি, দ্বিমুখী নীতি, প্রতারণা করা। ইসলামি পরিভাষায় একে বলা হয় "নিফাক" আর যে ব্যক্তি নিফাক করে তাকে বলা হয় "মুনাফিক"।

কপটতার নিদর্শন গুলো হলোঃ

১। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে।

২। ওয়াদা ভঙ্গ করে।

খ ওয়াদা ভঙ্গ করে।

৩। আমানত রাখলে তা খিয়ানত করে।

৪। ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।

৫। নিজেকে মুসলমান দাবি করে কিন্তু গোপনে ইসলামকে অস্বীকার করে।

৬। কপটতাকারী সামাজিক ও পার্থিব লাভের আশায় মত্ত থাকে।

৩ নবি-রাসুলের পার্থক্য বর্ণনা কর।

উত্তরঃ আল্লাহ তাআলা মানবজাতি-হিদায়াতের জন্য বহু নবি-রাসুল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ

"প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।"

(সুরা আররাদ ৭, আয়াত)

কুরআন মাজিদে ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম রয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবি-রাসুলের সংখ্যা অসংখ্য।

নবি ও রাসুলের অর্থের দিক থেকে দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ

যাদের উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে রাসুল বলা হয়। যাদের উপর আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়নি এবং পূর্ববর্তী রাসুলের উপর যে আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সেই কিতাবের অনুসরণ করে মানুষদের হেদায়েত করেছেন তাদেরকে নবী বলা হয়। প্রত্যেক রাসুলই নবি ছিলেন কিন্তু নবিগণ রাসুল নন।

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি ও রাসুল।

৪. হাশরের ময়দানে কয় ধরণের শাফায়াত কার্যকর হবে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কিয়ামতের পরের ধাপটি হলো হাশর। যেদিন পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে একত্রে জমায়েত করা হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

"সেইদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আসমানসমূহ

[illegible] এবং পরিবর্তিত করা হবে আসমানসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাজির হবে"।

(সূরা ইব্রাহিম: ৪৮)

হাশরের কার্যাবলী হবে সূক্ষ্ম আর শাফায়াত হবে এর একটি অংশ। হাশরের ময়দানে আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কেউ কথা বলার সাহস পাবে না। মূলত দুটি কারণে শাফায়াত করা হবে।

যথা:

১. পাপীদের ক্ষমা করা বা পাপ মার্জনা করার জন্য।

২. পুন্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভের জন্য।

আর শাফায়াত দুই ধরনের। যথা:

১. শাফায়াতে কুবরা: শাফায়াতে কুবরা হলো

সর্বশেষ শাফায়াত। শাফায়াতে কুবরা মুমিন
হিসাব কার্য শুরু করার শাফায়াত। কারণ
হাশরের সময়টা এতো কষ্টদায়ক হবে যে,
সূর্যের প্রচন্ড তাপে কারও হাঁটু, কারও
কোমড় বা কারও বুক পানিতে ডুবে যাবে তাদের
শরীরের ঘামে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে
নিপতিত থাকবে তখন হযরত আদম (আ.)
হযরত নুহ (আ.) হযরত মুসা (আ.) প্রভৃতি

প্রচন্ড তাপে কারও হাঁটু, কারও
কোমড় বা কারও বুক পানিতে ডুবে যাবে তাদের
শরীরের ঘামে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে
নিপতিত থাকবে তখন হযরত আদম (আ.)
হযরত নুহ (আ.) হযরত মুসা (আ.) প্রভৃতি
নবিদের নিকট উপস্থিত হয়ে শাফায়াতের
অনুরোধ করবে। কিন্তু তারা সকলেই

করার কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন, "আমাকে শাফায়াত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে"।

(সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

২. শাফায়াতে কুবরা: কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফায়াত করা হবে। এটাই শাফায়াতে কুবরা। নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ

আলিম, হাফেজগন এ শাফায়াত সুযোগ পাবে। কুরআন ও সিয়াম (রোজা) শাফায়াত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ আছে।

আমরা শাফায়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দেখানো পথে চলবো ফলে পরকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শাফায়াত যেন পাই সেই জন্য বেশি বেশি দোয়া পাঠ করবো।